পদটি যে চণ্ডীদাসের ...

॥ ১২ ॥

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক।।

■ **শব্দার্থ ও টীকা : পুছসি**—প্রশ্ন করছ, জিজ্ঞাসা করছ। **অনুভব মোয়**—আমার অনুভূতি। **সোই পিরিতি**—সেই প্রেম। **অনুরাগ বাখানিতে**—অনুরাগ ব্যাখ্যা করতে। 'অনুরাগ' শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে যে রাগ বা আসক্তি নিত্য নতুন রূপ লাভ করে তাকেই 'অনুরাগ' বলা চলে। **সোই পিরিতি....নূতন হোয়**—ভালোবাসার গুণ বর্ণনা করা যায় না, কারণ ভালোবাসা জড় পদার্থের মতো অসাড় নয়। প্রেম কখনও পুরানো হয় না, প্রেম তিলে তিলে প্রতি মুহূর্তে নূতন হয়। **জনম অবধি**—জন্ম থেকে। **হাম**—আমি। **রূপ নেহারলুঁ**—রূপ দেখলাম। **তিরপিত ভেল**—তৃপ্ত হল। **মধুর বোল**—মধুর বাণী, কথা। **শ্রবণহি**—কানের মধ্যে। **শুনলুঁ**—শুনলাম। **শ্রুতিপথে পরশ না গেল**— শ্রুতিপথে গিয়েও যেন স্পর্শ করল না, অর্থাৎ শুনেও যেন শুনলাম না—আবার

শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। **মধু যামিনী**—মধু রাত্রি। **রভসে গোঁয়াইলুঁ**—মিলনের আনন্দে কাটালাম। বসন্তকালের রাত্রিকেও মধু-যামিনী বলা হয়ে থাকে। **রভসে**—ক্রীড়াকৌতুকে। **না বুঝলুঁ কৈছন কেল**—কেমনভাবে কাটালাম, তা বুঝলাম না। **হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ**— হৃদয়ের উপর হৃদয় রাখলাম। **জুড়ন না গেল**—জুড়াল না। **বিদগধ জন**—রসিক বা পণ্ডিত ব্যক্তি। **অনুমগন**—নিমজ্জিত। **অনুভব কাহু না পেখ**—অনুভূতি কারো মধ্যে দেখতে পেলাম না। **লাখে না মিলিল এক**—লক্ষের মধ্যে এক জনকেও পাওয়া গেল না।

■ **আলোচনা :** সখি, আমার অনুভবের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করছো! সেই প্রেম অনুরাগ ব্যাখ্যা করতে গেলেই প্রতি মুহূর্তেই তা নতুন হয়ে ওঠে। জন্মাবধি আমি রূপ দর্শন করলাম কিন্তু আমার চোখ তৃপ্ত হল না, সেই মধুর কথা কত শুনলাম, কিন্তু কর্ণপথে তা স্পর্শ করেও গেল না। কত বসন্তের রাত লীলাবিলাসে কাটালাম কিন্তু সেই কেলি (ক্রীড়া) কেমন তা-ও বুঝলাম না। লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখলাম তবুও হৃদয় জুড়ালো না। কত বিদগ্ধ মানুষ সেই রসে নিমজ্জিত থাকলেও এর যথার্থ অনুভূতি কারো মধ্যে দেখলাম না। পদকর্তা কবিবল্লভ বলছেন, প্রাণের তৃষ্ণা জুড়িয়েছে এমন মানুষ লাখেও একজন মেলে না।

পূর্বরাগ পর্যায়ের এই পদটি বিতর্কিত। প্রথম বিতর্ক পদকর্তা কবিবল্লভকে নিয়ে। অনেকের মতেই এই কবিবল্লভ হচ্ছেন বিদ্যাপতি। কিন্তু পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় তা স্বীকার করেন না। কিন্তু অনেক প্রাচীন পণ্ডিত তো বটেই আধুনিক কালের বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে, পদটি বিদ্যাপতির রচনা। দ্বিতীয় বিতর্ক হল পর্যায় নিয়ে। অনেকেই একে আক্ষেপানুরাগ বা প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু পদটিতে শ্রীমতী রাধা বলেছেন, লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রেখেও হৃদয় জুড়াল না। রাধার এই আক্ষেপ, এই অনুভূতি থেকেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এটি পূর্বরাগ পর্যায়ের অনুরাগের পদ। অনুরাগই প্রিয়কে প্রতি মুহূর্তে নিত্য নতুনভাবে অনুভব করায়—'সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভব নব নব সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।'

পদটিতে শ্রীমতী রাধার অনুরাগের অপরূপ রহস্য ও মাধুর্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। শ্রীমতী তাঁর সখীদের বলেছেন, কৃষ্ণ প্রেমের অনুভূতি তিনি যতবার ভাষায় প্রকাশ করতে যান ততবারই তা তাঁর কাছে নতুন রূপে প্রতিভাত হয়। জন্মাবধি কৃষ্ণের রূপ দর্শন করে আসছেন তিনি, কিন্তু আজও তাঁর চোখের তৃষ্ণা মিটল না, তাঁর মধুমাখা কণ্ঠস্বর জন্মাবধি শুনে এলেও তাঁর শোনার তৃপ্তি হল না। কত মধু যামিনীর মিলন-লগ্ন কৃষ্ণ সান্নিধ্যে কাটালেও সেই মিলন রহস্য তাঁর কাছে কোনদিন উন্মোচিত হল না, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে সেই পরম প্রেমময় কৃষ্ণের হৃদয়ে হৃদয় সংস্থাপিত করেও তাঁর হৃদয় জুড়াল না।

প্রেমের চিরন্তন রহস্যময়তার কথাই পদটিতে ব্যক্ত হয়েছে। প্রেম চির-অনন্ত, চির-অসীম—কোন সীমায় তাকে বাঁধা যায় না, কোথাও তার অন্তও খুঁজে পাওয়া যায় না। অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে ভেসে আসা প্রেমের চিরন্তন বেদনা বিধুর আর্তির রক্তিম প্রকাশ ঘটেছে শ্রীমতী রাধার চির-অতৃপ্তিতে। বৈষ্ণব সাহিত্যের তত্ত্ব ও দর্শনের কথা বাদ দিলেও পদটিতে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের চির-অতৃপ্তির চিরন্তন হৃদয়ার্তির প্রকাশে

পদটি এক আশ্চর্য কাব্য সুষমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী রাধা পূর্বরাগ থেকে অনুরাগের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। পদটি সম্পর্কে অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু লিখেছেন—"রভস মূর্ছিতা রাধিকা কোন আচম্বিত মুহূর্তে বঁধুর মুখ দেখিয়া ফেলিলেন। কী দেখিলাম! এতদিন কি দেখেন নাই? হয়তো, হয়তো নয়। দেখিয়াছি, আবার দেখিও নাই। একদিন নয়, দুইদিন নয়, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ,' তবু কেন এই বিস্ময়, কেন এই দর্শন-লালসা, স্পর্শ-কামনা, রতি-বাসনা? কেন, কে বলিবে? ইহাই তো মানব জীবনের পরম রহস্য; সর্বজীবের দুর্ভেদ্য সমস্যা। চিরন্তন নারী সেই যে একবার মিলনের মদির মুহূর্তে চিরন্তন পুরুষের অনাদি রূপ-রহস্য, অনন্ত প্রাণ-বিস্ময়টুকু নয়নগোচর হৃদয়গোচর করিয়াছিল,—তাহার পর সেই যে রতির দাহ হইতে আরতির দীপ শিখা জ্বালাইয়া সে অনন্ত—অনন্তকাল হৃদয় দেবতার অর্চনা করিয়া চলিয়াছে, তাহার শেষ নাই, শেষ হইবে না। নিখিল প্রাণ-রাধিকা প্রাণ-আরাধিকা প্রাণপতি কৃষ্ণের দিকে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া থাকিবেই, তাহাতে রূপের কামনা, রসের বাসনা, তৃপ্তির নিবিড়তা, তৃষ্ণার বিধুরতা।

—এই একটি পদ বিদ্যাপতির কবিত্ব শক্তির সীমা নির্দেশক হইয়া আছে।"

॥ ১ ॥

কণ্টক গাড়ী কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

■ **শব্দার্থ ও টীকা : কণ্টক গাড়ী**—কাঁটা পুঁতে। **কমলসম পদতল**—পদ্মের ন্যায় কোমল ও সুন্দর চরণতল। **মঞ্জীর**—নুপুর। **চিরহী**—বস্ত্রখণ্ড দ্বারা। **ঝাঁপি**—আবৃত করে। **কণ্টক গাড়ি.....ঝাঁপি**—কাঁটা পুতে, কমলের ন্যায় কোমল চরণের নূপুর বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আবৃত করে, পাছে নূপুরের শব্দ শোনা যায়—এই আশঙ্কায়। **গাগরি-বারি**—কলসীর জল। **ঢারি**—ঢেলে। **চলতহি অঙ্গুলি চাপি**—আঙুল টিপে টিপে চলছেন। **গাগরি বারি.....চাপি**—কলসী কলসী জল ঢেলে উঠোন পিছল করে মাটিতে পায়ের আঙুল টিপে টিপে চলছেন। বর্ষাকালের পিচ্ছিল পথে অভিসারে যেতে যাতে না অসুবিধা নয়, সেইজন্যেই অভ্যাস করছেন। **মাধব**—কৃষ্ণ। **তুয়া**—তোমার। **অভিসারক লাগি**—অভিসারের জন্য। **দুতর পন্থ**—দুস্তর পথ। **গমন**—যাবার জন্য। **ধনি**—শ্রীমতী রাধা। **সাধয়ে**—সাধনা করছেন। **যামিনী**—রাত্রি। **মাধব তুয়া.....যামিনী জাগি**—হে মাধব, তোমার জন্য অতি দুস্তর পথ কিভাবে অতিক্রম করবেন, নিজের ঘরে রাত জেগে রাধা সেই অভিসারের সাধনা বা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। **কর-যুগে**—দু'টি হাত দিয়ে। **মুদি চলু**—বন্ধ করে চলছেন। **ভামিনী**—যুবতী নারী, এখানে রাধিকা। **তিমির-পয়ানক**—অন্ধকার কাটাবার জন্য। **তিমির-পয়ানক আশে**—আঁধার রাত্রে প্রিয়তমের কাছে যেতে হবে বলে, অন্ধকার কাটাবার আশায় অর্থাৎ অন্ধকারে পথ চলার চেষ্টায়। **কর-কঙ্কণ-পণ**—হাতের কাঁকন পণ করে। **ফণিমুখ**

বন্ধন—সাপের মুখ বন্ধন করার কৌশল, সাপ যাতে কামড়াতে না পারে। **শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে**—সাপের ওঝার নিকট শিক্ষা করছেন সাপকে বশ করার মন্ত্র। **গুরুজন-বচন**—গুরুজনদের কথা। **বধির**—যে কানে শোনে না। **মানই**—মনে করে। **আন শুনই**—এক শোনে। **মুগধী**—মূর্খ, নির্বোধ। **হাসই**—হাসেন। **পরমাণ**—প্রমাণ বা সাক্ষী। **পরিজন বচনে....হাসই**—আত্মীয়-পরিজনরা কোন কথা বললে রাধা বোকার মতো হাসতে থাকেন। রাধা কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন, ফলে গুরুজনদের কোন কথা তাঁর কানে ঢোকে না, এক শুনতে অন্য শোনেন। এজন্য তাঁকে অনেক নিন্দামন্দও শুনতে হয়, কিন্তু তাতেও তিনি কান দেন না, তিনি শুধু বোকার মতো হাসতে থাকেন।

আলোচনা : গোবিন্দদাসের লেখা অভিসার পর্যায়ের পদ। শ্রীমতী রাধা এখানে অভিসারের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাটির উপর কাঁটা পুঁতে পদ্মের মতো কোমল পায়ের নূপুর বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে বা আবৃত করে, কলসী কলসী জল ঢেলে গৃহপ্রাঙ্গণ পিচ্ছিল করে, পায়ের আঙ্গুল টিপে টিপে চলার অভ্যাস করছেন। হে মাধব, তোমার কাছে অভিসারে যাবার জন্যই শ্রীমতী রাধা, দুরতিক্রমনীয় পথ কেমন করে পাড়ি দিতে হবে, নিজের ঘরে রাত্রি জেগে তারই সাধনা করছেন। অন্ধকারে পথ চলার অভ্যাস করার জন্য দু'হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁটার চেষ্টা করছেন। অন্ধকার বৃষ্টিমুখর পথে সাপ থাকতে পারে, তাই সাপের ওঝাকে ডেকে এনে সাপের মুখ বন্ধ করার বা সাপকে বশ করার মন্ত্র শিখে নিচ্ছেন, তার বিনিময়ে নিজের হাতের কাঁকন মূল্য হিসেবে দিচ্ছেন। গুরুজনদের কথা তিনি যেন শুনেও শোনেন না, বধিরের মতো এক শোনেন আর অন্য উত্তর দেন। পরিজনদের কথা শুনে বোকার মতো হাসতে থাকেন।

পদটি অভিসার পর্যায়ের—বর্ষাভিসারের। আক্ষরিক অর্থে শ্রীমতী রাধার অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি। নায়ক বা নায়িকা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যখন গোপনে কোনো সংকেত কুঞ্জের দিকে যাত্রা করেন, বৈষ্ণব পদাবলীতে তাকেই অভিসার বলা হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর এই অভিসারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অজস্র বিপদ, দুরতিক্রমনীয় বাধা, নায়ক-নায়িকার ঐকান্তিক আগ্রহ, দুর্জয় সাহস ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা। গোবিন্দদাসের এই পদটিতে শ্রীমতী রাধার অভিসার যাত্রার কঠোর ও নিবিড় প্রস্তুতির পরিচয় আমরা পাই। এই পদটিতে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'-এর একটি পদের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

> "মার্গে পঙ্কিণী তোয়দন্ধতমসে নিঃশব্দ সঞ্চারকং।
> গন্তব্যা দয়িতস্য মেইদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বামতিম্।।
> আজানুদ্ধৃত নূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশম।
> কৃচ্ছ্রাল্লব্ধ পদস্থিতি স্বভবনে পন্থানমভ্যসতি।।

—'পিচ্ছিল পথে অন্ধকারে প্রিয় মিলন-অভিসারে যাওয়ার জন্যে পথ চলতে হবে গোপনে একা, সেই কথা ভেবে এক মুগ্ধা নারী তাঁর পায়ের নূপুর জানু পর্যন্ত তুলে, করতলে চোখ আবৃত করে নিজ ভবনে পথ চলা অভ্যাস করছেন।'

ভগবানের আহ্বানবাণী ভক্তের কানে একবার যদি প্রবেশ করে তখনই সমাজ-সংসার ফেলে, সমস্ত বিপদ-বাধা তুচ্ছ করে ভক্তের অভিসার যাত্রা শুরু হয়। ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতীক্ষায় ভক্ত অনুক্ষণ নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে মাধব পরমাত্মা,

রাধা জীবাত্মা। কৃষ্ণ ভগবান, রাধা ভক্ত। ভক্ত রাধা তাঁর ভগবান কৃষ্ণের কাছে অভিসারে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর সেই প্রস্তুতি বড় কঠোর, বড় কঠিন। বর্ষণমুখর রাত্রে অন্ধকার পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে তাঁকে যেতে হবে অভিসারে। হতে পারে সে পথ কণ্টকাকীর্ণ কিম্বা থাকতে পারে বিষধর সাপ—সে সব অতিক্রম করেই তাঁকে যেতে হবে। রুণু রুণু শব্দে ভেঙ্গে যেতে পারে গুরুজনদের ঘুম তাই পায়ের নূপুর বেঁধে নিতে হবে বস্ত্র খণ্ডে। অবিরত বর্ষণে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ হাঁটতে হবে, তাই কলসী কলসী জল ঢেলে গৃহাঙ্গণ কর্দমাক্ত করে পায়ের আঙুল টিপে টিপে চলার অভ্যাস করছেন তিনি। দু'হাতে ঢেকে রাখছেন চোখ, কারণ অন্ধকার রাত্রে তো তিনি পথ দেখতে পাবেন না। শিখে নিতে হচ্ছে সাপকে বশীভূত করার মন্ত্রও। তাঁর এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে গুরুজনরা কিছু জিজ্ঞাসা করলে হয় তিনি উত্তর দিচ্ছেন না অথবা ভান করছেন না শোনার, আর পরিজনদের প্রশ্নের উত্তরে বোকার মতো হাসছেন শুধু। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ঈশ্বর সাধনার দুর্গম পথ পরিক্রমার কথাই এই পদটিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে— 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' শ্রীমতী রাধার এই অভিসার-সাধনা তো ঈশ্বর সাধনারই নামান্তর।

॥ ৪ ॥

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার।।
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত।।
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার।।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।।

■ **শব্দার্থ ও টীকা : মন্দির**—ঘর, গৃহ। **বাহির**—বাইরে। **কঠিন কপাট**—শক্ত দরজা। **চলইতে**—চলতে গেলে। **শঙ্কিল**—শঙ্কাপূর্ণ, ভীতিজনক। **পঙ্কিল**—কর্দমাক্ত। **বাট**—পথ। **মন্দির বাহির....বাট**—ঘরের বাইরের দরজা শক্ত করে বন্ধ করা, অথচ রাধা অভিসারে যাবেন। সেকথা অনুমান করেই তাঁর শঙ্কা। **শাশুড়ি-ননদী**—জটিলা ও কুটিলা ঘরের দরজা শক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া অবিরল বর্ষণে পথও অতিশয় পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত, তাই সখিরা তাঁকে যেতে নিষেধ করছেন। **তহিঁ**—তার ওপর। **দূরতর**—প্রবল, বহুদূরব্যাপী। **বাদর দোল**—বৃষ্টির দোলা। **বারি**—জল। **বারই**—নিবারণ করে। **নীল-নিচোল**—নীল শাড়ির আঁচল। **কৈছে**—কেমন করে। **হরি রহ**—কৃষ্ণ আছেন। **মানস-সুরধুনী**—মানসগঙ্গা। **পার**—পারে। **বজর-নিপাত**— বজ্রপাত হচ্ছে। **শুনইতে**—শুনতে। **মরম জরি যাত**—হৃদয় জ্বলে যায়। **দশ দিশ**—দশ দিক। **দহন বিথার**—বিস্তর জ্বালা। **হেরইতে**—দেখতে। **উচকই**—উচ্চকিত হয়, চমকে ওঠে। **লোচন-তার**—চোখের তারা। দশদিক জুড়ে বিদ্যুতের অগ্নি বিস্তার করছে, তাকাতেই চোখ ঝলসে যাচ্ছে। **ইথে**—এখন। **তেজবি**—ত্যাগ করবি। **গেহ**—গৃহ। **প্রেমক লাগি**—প্রেমের জন্য। **উপেখবি**—উপেক্ষা করবি। **দেহ**—শরীর। **ইথে যদি ...উপেখবি দেহ**—ওগো সুন্দরী এর পরেও যদি তুমি ঘরের বাইরে যাও, তাহলে

কি প্রেমের জন্য শরীরকেও উপেক্ষা করবে? **ইথে**—ইহাতে। **বাণ**—তীর। **কিয়ে**—আর কি। **নিবার**—নিবারণ করা যায়। গোবিন্দদাস. . . .**যতনে নিবার**—পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, এতে আর বিচার করার কি আছে! যে বাণ একবার ধনু থেকে বেরিয়ে যায় তাকে কি আর চেষ্টা করলেও থামানো যাবে? রাধা এখন কৃষ্ণ-প্রেমের আকর্ষণে সংসার উপেক্ষা করে অভিসারে যাবার জন্য প্রস্তুত। তাঁর মন এখন সঙ্কেতকুঞ্জে কৃষ্ণ সন্নিধানে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে, শত চেষ্টা করেও এখন আর তিনি থামতে পারবেন না।

■ **আলোচনা** : ঘরের বাইরে শক্ত দরজা। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে চলতেও ভয়। তার উপরে দুরন্ত বাদলের দূরব্যাপ্ত ঝড় বা দোলা। নীল শাড়ি কি পারবে সেই বৃষ্টির ধারা আটকাতে! সুন্দরী, তুমি এই সময় কি করে অভিসারে যাবে! হরি তো রয়েছেন মানসগঙ্গার ওপারে। ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঘনঘন বজ্রপাত যা কানে শুনলে মর্মস্থল পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। দশদিক জুড়ে বিদ্যুতের বিস্তৃত দহন, তাকালেই চোখ ঝলসে যাচ্ছে। এতেও সুন্দরী তুমি যদি ঘর ছেড়ে অভিসারে যাবে তাহলে প্রেমের জন্য তোমাকে শরীরও উপেক্ষা করতে হবে। গোবিন্দদাস বলছেন, এখন আর সে সব বিচার করে অর্থাৎ ভেবে কি হবে? নিক্ষিপ্ত তীরকে শত চেষ্টাতেও নিবৃত্ত করা যায় না।

গোবিন্দদাসের লেখা বর্ষাভিসারের পদ। শ্রীমতী রাধার অভিসার যাত্রার প্রতিবন্ধকতার কথাই এখানে দ্যোতিত হয়েছে। তাঁর অভিসারের পথে অনেক রকমের বাধা। যেমন ১. ঘরের শক্ত পোক্ত কঠিন দরজা, ২. গুরুজনদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ৩. অন্ধকার রাত্রির অবিরত বৃষ্টিপাত, ৪. চলার পথ কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক, ৫. ঘন ঘন বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ, ৬. মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চোখ ঝলসে দেওয়া চমকানি। এত বাধা সত্ত্বেও শ্রীমতী রাধা অভিসারে যাবেনই। কারণ তাঁর অভিসার তো শুধু অভিসার নয়, তাঁর অভিসার হল প্রেম তপস্যা। সেই তপস্যার পথ কত দুর্গম, কত বিঘ্ন, কত বিপদ, কত দুরতিক্রমনীয় বাধা, সেই তপস্যায় সিদ্ধি কত দুর্লভ তার সমস্ত পরিচয়ই গোবিন্দদাস এখানে দিয়েছেন। শ্রীমতী রাধা দু'রকমের বাধারই সম্মুখীন—মানুষী ও প্রাকৃতিক। মানুষী বাধা তো চিরকালই ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদ্দাম প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা। এখন অভিসারে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এখন আর কোন উপায় তো নেই, ধনুর মুক্ত বাণ যেমন শত চেষ্টাতেও নিবৃত্ত করা যায় না, তেমনি পরমের আহ্বান একবার শুনতে পেলেই, তাকে অস্বীকার করার আর কোন উপায় নেই।

॥ ৫ ॥

কুল মরিযাদ-

কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ

তাহে কি কাঠতি

।। ৭ ।।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।।
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।।
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী।।

■ **শব্দার্থ ও টীকা : এ ঘোর রজনী**—এই গভীর রাত্রি। **মেঘের ঘটা**—মেঘের আসা-যাওয়া, মেঘাচ্ছন্ন। **আইল**— এল। **বাটে**—পথে, বাট > বর্ত্ম > বট্টা > বাট। **আঙ্গিনা**—উঠান। **বঁধুয়া**—বন্ধু, প্রেমিক। এখানে কৃষ্ণ। **ভিজিছে**—ভিজছে। **দেখিয়া পরাণ ফাটে**—দেখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। **সই, কি আর বলিব তোরে**—সখী, তোকে আর কি বলব। **কোন্ পুণ্যফলে**—কোন্ পুণ্যের ফলস্বরূপ। **সে হেন বঁধুয়া**—তার মতো বন্ধু, কৃষ্ণের মতো বন্ধু। **আসিয়া মিলল মোর**—আমার সঙ্গে এসে মিলিত হল। **ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ**—রাধার ঘরে গুরুজন, দুর্বিনীত ননদিনী। **বিলম্বে বাহির হৈনু**—দেরী করে বের হয়েছি। **সঙ্কেত করিয়া**—ইশারা করে। **যাতনা**—যন্ত্রণা। **বঁধুর পিরীতি আরতি**

দেখিয়া—বন্ধুর, প্রেমিকের প্রেমের আর্তি দেখে। **মোর মনে হেন করে**—আমার মনে এমন করে। **কলঙ্কের ডালি**—কলঙ্কের বোঝা। **আনল ভেজাই**—আগুন লাগিয়ে দিই। কৃষ্ণের প্রেমের আর্তি দেখে রাধার মন থেকে কলঙ্কের ভয় দূর হয়ে যায়, তাঁর মনে হয় কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন। **আমার**—রাধার। **আমার দুখের দুখী**—রাধার দুঃখই কৃষ্ণের দুঃখ।

■ **আলোচনা** : চণ্ডীদাসের অভিসার পর্যায়ের পদ। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলনে এটি রসোদগারের পদ হিসেবে চিহ্নিত। পদটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে অভিসার রাধার নয়—কৃষ্ণের। শ্রীমতী রাধা তাঁর সখীকে ডেকে বলছেন, এই ঘোর অন্ধকার রাত্রি, আকাশে মেঘের ঘনঘটা, এই অবস্থায় কৃষ্ণ কেমন করে কেবলমাত্র তাঁর জন্যই পথে নেমেছেন। এই বিরামবিহীন বৃষ্টিতে তাঁরই উঠোনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে ভিজতে দেখে শ্রীমতী রাধার কষ্টে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। সখীর কাছে কৃষ্ণের জন্য তাঁর সেই বেদনাময় উপলব্ধিরই প্রকাশ। তিনি সখীকে বলছেন, বহু জন্মের পুণ্যের ফলে কৃষ্ণের মতো প্রেমিক তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন।

শ্রীমতী রাধার ঘর নিরানন্দের। ঘরে গুরুজন, নিষ্ঠুর ভীষণা-প্রকৃতির ননদিনী, তাদের সবার চোখ এড়িয়ে বাইরে বেরোতে তাঁর দেরী হয়ে গেছে। অথচ তিনি নিজেই প্রথমে কৃষ্ণকে মিলনের ইশারা করেছিলেন—যার জন্য কৃষ্ণকে এত কষ্ট পেতে হল। কৃষ্ণের প্রেমের আকুলতা দেখে রাধার মনে হয়েছে যে সমস্ত কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবেন। রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমের গভীরতা এমনই যে রাধার জন্য নিজের দুঃখকে তিনি দুঃখ বলে মনেই করেন না, বরং রাধার দুঃখেই তাঁর দুঃখ। আসলে তিনি শ্রীমতী রাধার দুঃখের সমব্যথী। তাই পদকর্তা চণ্ডীদাস জানাচ্ছেন, কৃষ্ণের এমন প্রেমের কথা শুনে জগৎ ধন্য হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় এই পদটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন— "ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না। পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজের মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্ত চিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।"

আবার অন্য এক জায়গায় পদটির অসামান্য ব্যঞ্জনার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, চণ্ডীদাস একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়ে লিখিয়ে নেন। শ্রীকৃষ্ণকে উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিজতে দেখে শ্রীমতী রাধার মন বেদনায় ভরে গেছে, অন্যদিকে আবার একইসঙ্গে সখীদের কাছে নিজের সৌভাগ্যের কথাও উল্লেখ করছেন। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই। প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস—ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিল, তাহা তো সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিল না, তাহা কতখানি। যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে

ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গা-ভঙ্গা, এই উত্থান-পতন, কত অল্পকথায়, কত সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ।"

অসাধারণ প্রকাশ কৌশল ও শিল্প উৎকর্ষময় এই পদটি অভিসার পর্যায়ের পদ-সাহিত্যে অবশ্যই কিছু স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।